গ্রীক, শক, পার্থিয়ান ও কুষাণদের অভিযানের ফলে সংস্কৃত সাহিত্য বিনাশ প্রাপ্ত হয়েছিল এবং গুপ্ত রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ঐ সাহিত্যের পুনর্জাগরণ ঘটেছিল।

ম্যাক্সমুলার কর্তৃক প্রদত্ত গুপ্তযুগে সংস্কৃত সাহিত্যের পুনর্জাগরণের এই তত্ত্বটি একসময় বুদ্ধিজীবী মহলে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালের গবেষণা থেকে এই ধারণা ভ্রান্ত বলে মনে হয়েছে। বহু প্রথিতযশা পণ্ডিত যথা— জি. বুহলার, জে. এফ. ফ্লীট অত্যন্ত যুক্তি সহকারে দেখিয়েছেন যে ভারতবর্ষ থেকে সংস্কৃত সাহিত্য কখনই অবলুপ্ত হয়ে যায়নি। পণ্ডিতেরা আরো দেখিয়েছেন যে বিদেশীয় শক্তিসমূহ যথা শক ও কুষাণরা ভারতবর্ষের হিন্দু অংশ জয় করার পর নিজেরাও ধীরে ধীরে ভারতীয় হয়ে গিয়েছিল এবং ভারতীয় সাহিত্য ও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতাও করেছিল। এ-প্রসঙ্গে তাঁরা প্রথম কনিষ্ক ও প্রথম রুদ্রদামনের নামোল্লেখ করেছেন, যাঁরা সংস্কৃত সাহিত্যের বিকাশে অভাবনীয় উৎসাহ প্রদর্শন করেছিলেন। সুতরাং ভারতবর্ষ থেকে মৌর্যোত্তর যুগে সংস্কৃত সাহিত্যের অবসান ঘটেছিল, এমন ধারণা নিতান্তই অমূলক। বস্তুতপক্ষে গুপ্ত-পূর্ব যুগে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত, ভাসের রচিত বিভিন্ন নাটক এই যুগের সংস্কৃত সাহিত্যের অনন্য সম্পদ। অবশ্য গুপ্তযুগে সংস্কৃত ভাষা যেমন সরকারি ভাষায় পরিণত হয়েছিল গুপ্ত-পূর্ব যুগে তা ছিল না। এই সমস্ত দিক বিচার বিশ্লেষণ করে একথা বলাই বাহুল্য হবে যে গুপ্তযুগ সংস্কৃত সাহিত্যের পুনর্জাগরণ বা নবজাগরণের যুগ বলে চিহ্নিত নয়, বরং একে সংস্কৃত সাহিত্যের অভাবনীয় অগ্রগতি বা পূর্ণ পরিণতির যুগ হিসাবে চিহ্নিত করাই শ্রেয়।

এখন সংস্কৃত ভাষায় গুপ্ত ও প্রাক্ সমকালীন যুগে ভারতবর্ষে রচিত সাহিত্যিক কর্মকাণ্ডের কথা আলোচনা করা বাঞ্ছনীয় হবে। গুপ্তযুগের সাহিত্যকে ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ এই দুটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। ধর্মীয় সাহিত্যের মধ্যে পুরাণসমূহ, স্মৃতিশাস্ত্র এবং মহাকাব্যকে বোঝানো হয়ে থাকে। ধর্ম নিরপেক্ষ সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে কালিদাসের বিভিন্ন কাব্য ও নাটককে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

সংস্কৃত ভাষায় পুরাণগুলি সংস্কৃত সাহিত্যের উৎকর্ষের একটি অন্যতম দিক বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। প্রধান প্রধান পুরাণের সংখ্যা মোট আঠারোটি হলেও বায়ু, ব্রহ্মাণ্ড, বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণ গুপ্তযুগে পূর্ণতালাভ করেছিল। কেননা, এই পুরাণগুলিতে সাম্রাজ্যবাদী গুপ্ত শাসকদের নামোল্লেখ আছে। পুরাণগুলির মূল রচয়িতা মহাকাব্যগুলির ন্যায় ছিলেন সূত বা চারণ কবিরা। এই কারণেই বেশিরভাগ পুরাণে সূতলোমহর্ষণ ও তাঁর পুত্র উগ্রশ্রবস বক্তা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছেন। পুরাণে সাধারণ পাঁচটি বিষয়ের (পঞ্চলক্ষণ) বর্ণনা রয়েছে। এগুলি হল সর্গ বা বিশ্ব প্রপঞ্চের সৃষ্টি, প্রতি সর্গ বা

ধ্বংসপ্রাপ্তের পর পুনরায় সৃষ্টি, বংশ বা বংশতালিকা, মন্বন্তর বা মনু দ্বারা শাসিত বিভিন্ন যুগের কথা এবং বংশানুচরিত বা সূর্যবংশ ও চন্দ্রবংশের ইতিহাস। একথা অবশ্য সত্য যে সমস্ত পুরাণগুলির ক্ষেত্রে এই পাঁচটি লক্ষণের প্রয়োগ ঘটেনি। প্রসঙ্গত বলা যায় গুপ্তযুগে হিন্দুধর্মের আচার অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় সংযুক্ত করে পুরাণগুলিকে নতুন রূপ দেবার চেষ্টা নেওয়া হয়েছিল। এছাড়া, মনুসংহিতা ও যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে বর্ণিত হিন্দু আচার অনুষ্ঠানগুলিও পুরাণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বস্তুত পুরাণগুলির মাধ্যমে স্মার্ত-শৈব এবং স্মার্ত-বৈষ্ণব নামে নতুন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল। এদের বলা হয়ে থাকে যে, যে সমস্ত মানুষ শৈব অথবা বৈষ্ণব হওয়া সত্ত্বেও স্মার্তমত পুরোপুরি বর্জন করতে চায়নি তাদের প্রয়োজনের দিকে তাকিয়েই এই হিন্দু ধর্মের সৃষ্টি ঘটেছিল।

পুরাণ ছাড়াও বেশিরভাগ ধর্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্রের রচনাও সম্পূর্ণতা লাভ করে গুপ্তযুগে অথবা এর অল্পকাল আগে। এ-যুগের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ধর্মশাস্ত্র হল কাত্যায়ন স্মৃতি। এতে আইন ও আইনগত প্রতিষ্ঠানসমূহের উল্লেখ আছে। কাত্যায়ন স্মৃতির রচনাকাল আনুমানিক ৪০০ খ্রিঃ-এর মধ্যে। এই গ্রন্থটির অবিকল পাওয়া যায়নি। কেবল বিভিন্ন উদ্ধৃতি থেকে কাত্যায়ন স্মৃতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া সম্ভব হয়। কাত্যায়নের প্রায় সমসাময়িক হল দেবল স্মৃতি। এছাড়া ব্যাসের স্মৃতি গ্রন্থ রচিত হয়েছিল অনুমানিক ২০০ খ্রিঃ থেকে ৫০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। ২৫০টি শ্লোকে রচিত এই স্মৃতি গ্রন্থটি চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত। পরাশর স্মৃতি গ্রন্থটিও সম্ভবত গুপ্তযুগের মধ্যেই রচিত হয়েছিল। গুপ্তযুগের শেষদিক থেকে বিভিন্ন স্মৃতি গ্রন্থের ওপর টীকা রচনার কাজ শুরু হয়। টীকা রচয়িতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন অসহায়। নারদস্মৃতির ওপর লেখা তাঁর গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য টীকায় থাকা বিভিন্ন উদ্ধৃতি থেকে বোঝা সম্ভব হয় যে তিনি গৌতম ও মনু স্মৃতির ওপরও টীকা রচনা করেছিলেন।

সংস্কৃত সাহিত্য : কালিদাস

সংস্কৃত ভাষায় ধর্ম নিরপেক্ষ সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে গুপ্তযুগ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সমাজের উচ্চস্তরের মানুষ, বিশেষ করে রাজপরিবারে, অভিজাত বংশের লোকেদের জন্য সংস্কৃত ভাষায় গদ্য ও কাব্য রচিত হত। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত কবি ও নাট্যকার কালিদাসের নাম প্রথমেই মনে আসে। সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে যে কালিদাসের খ্যাতি, নিঃসন্দেহে তা ভারতীয় ও পাশ্চাত্যের পণ্ডিতেরা একবাক্যে স্বীকার করে থাকেন। কালিদাসের আবির্ভাব ঠিক কোন্ শতকে ঘটেছিল সে-বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কিছুটা মতপার্থক্য আছে। এক শ্রেণীর ঐতিহাসিকদের মধ্যে এই ধারণা প্রচলিত আছে যে কালিদাস আবির্ভূত হয়েছিলেন খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে। কারণ উজ্জয়িনীর বা বি

অনুসারে ঐ শতকে উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাকবি ছিলেন তিনি। কিন্তু এই মত যে ভ্রান্ত তা ইতিপূর্বে ঊনবিংশ অধ্যায়ে 'দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ও কিংবদন্তী বিক্রমাদিত্য' প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

কালিদাসের সময়কাল সম্পর্কে সাধারণ গৃহীত মত হল এই যে তিনি গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (যিনি বিক্রমাদিত্য নামেও পরিচিত ছিলেন)-এর রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন এবং তাঁর রাজসভাতে তথাকথিত নবরত্নের মধ্যে একজন উজ্জ্বল রত্ন হিসাবে পরিগণিত ছিলেন। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পিছনে প্রধানত দু-তিনটি আকর উপাদানকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। একটি হল কালিদাসের লেখা নাটক মালবিকাগ্নিমিত্রম। এই নাটকে শুঙ্গবংশীয় শাসক অগ্নিমিত্রের (আঃ খ্রিঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগ) রাজত্বকাল সম্পর্কিত তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। দ্বিতীয় তথ্য হল তাঁর রঘুবংশ কাব্যে সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয় এবং অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের বিবরণ আছে। তৃতীয়ত, ৪৭৩ খ্রি-এ উৎকীর্ণ সংস্কৃত ভাষায় বৎসভট্টি রচিত প্রথম কুমারগুপ্ত ও বন্ধুবর্মণের মান্দাসোর লেখটির রচনা শৈলীর সঙ্গে কালিদাসের বিভিন্ন রচনার অদ্ভুতপূর্ণ মিল লক্ষ করা যায়। সর্বোপরি, চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর আইহোল প্রশস্তির রচয়িতা রবিকীর্তি কালিদাসকে একজন শ্রেষ্ঠ কবি বলে উল্লেখ করেছেন। এই সমস্ত বিভিন্ন তথ্যাবলি বিচার বিশ্লেষণ করলে কালিদাসের আবির্ভাবের সময়কাল সম্পর্কে নির্দিষ্ট তারিখ বা শতক নির্ণয় করতে না পারলেও অন্তত একটা সময়কালের পরিধির মধ্যে তাঁর আবির্ভাবকে নির্দিষ্ট করা যেতে পারে। আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা গেছে যে তিনি এমন এক সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন যখন অগ্নিমিত্রের সময়কাল অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল এবং যাঁর পরবর্তী ছিলেন আইহোল প্রশস্তির রচয়িতা রবিকীর্তি। এখানে আরো একটা কথা মনে রাখা দরকার যে পূর্বে উল্লেখিত ৪৭৩ খ্রি-এর মান্দাসোর লেখটিতে কালিদাসের মেঘদূত ও ঋতুসংহার কাব্য দুটির প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছিল। এই তথ্যটি থেকে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, কালিদাস ৪৭৩ খ্রিস্টাব্দের পূর্বেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। সুতরাং বিভিন্ন তথ্যের আলোকে কালিদাসের সময়কালকে খ্রিঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকের পর থেকে খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতক, বিশেষ করে ৪৭৩ খ্রি-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ করা বাঞ্ছনীয় হবে।

কালিদাসের বিভিন্ন রচনাবলী (পরে আলোচিতব্য) পাঠ করলে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হল তিনি ছিলেন উজ্জয়িনীর এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। শৈব ধর্মের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল। ভারতবর্ষের প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহ ভ্রমণ করে তিনি বিশাল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। ভারতবর্ষের বিস্তৃত ভূ-ভাগ পরিভ্রমণ করার ফলে হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা এবং বঙ্গোপসাগর থেকে আরবসাগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশ ও আবহাওয়া সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। [illegible]

সংযোজনও করেছেন। স্বর্গের অপ্সরা উর্বশী এবং মর্ত্যের রাজা পুরুরবার মধ্যে প্রেমই হল এই নাটকের প্রধান বিষয়বস্তু। এই নাটকটিকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কালিদাস সমাপ্ত করেছেন। তবে ঘটনার বিন্যাসে তিনি যত না পারদর্শী হয়েছেন তার থেকে অনেক বেশি পারদর্শিতা দেখাতে পেরেছেন চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে।

অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটকটি নিঃসন্দেহে কালিদাসের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। কেবলমাত্র সংস্কৃত সাহিত্য নয়, পৃথিবীর সাহিত্য জগতে এই নাটকটির স্থান অনন্য বললেও মনে করা হয়ে থাকে, বিখ্যাত কবি গোটের মাধ্যমে ইওরোপের সাহিত্য জগতেও শকুন্তলার নাম ছড়িয়ে পড়েছে। মহাভারতের শকুন্তলার কাহিনী অবলম্বনের ভিত্তিতেই কালিদাস এটি রচনা করেছিলেন। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে ঐ কাহিনীর সঙ্গে তিনি কিছু নতুন চরিত্র ও নাটকীয় যোজনা সৃষ্টি করেছিলেন। এই নাটকটির পটভূমিতে রয়েছে প্রেম ও প্রকৃতি উভয়ই। বস্তুত প্রকৃতি ও প্রেমের প্রতি এক অপূর্ব সুবিচার করার চেষ্টা করা হয়েছে এই নাটকটিতে। কণ্বমুনির পালিতা কন্যা শকুন্তলার সঙ্গে দুষ্মন্তের প্রণয়, ও শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা এবং পরে আবার তাঁকে দুষ্মন্তের প্রত্যাখ্যান ও শেষপর্যন্ত শকুন্তলার সঙ্গে দুষ্মন্তের পুনর্মিলনকে অত্যন্ত সুনিপুণ দক্ষতার সঙ্গে তিনি তুলে ধরেছেন। এছাড়া, শকুন্তলার প্রতি তাঁর প্রিয় দুই সখী অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার প্রেম যে কত নিবিড় তাও এতে তুলে ধরা হয়েছে।

কালিদাসের কাব্যগুলির মধ্যে দুটি মহাকাব্যের পর্যায়ে পড়ে। এগুলির মধ্যে একটি হল রঘুবংশ এবং অপরটি হল কুমারসম্ভব। উনিশটি সর্গে বিভক্ত রঘুবংশ কাব্যটি— তথাপি এটি অসম্পূর্ণ। প্রধানত রামায়ণ এবং বায়ুপুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণের ওপর নির্ভর করে কালিদাস এই কাব্যে সূর্য বংশের ত্রিশজন রাজার নামের তালিকা তৈরি করেছেন। এই কাব্যের প্রধান বিষয়বস্তু হল সূর্যবংশীয় রামচন্দ্র ও তাঁর পূর্ব পুরুষদের বর্ণনা। পূর্বপুরুষদের মধ্যে সবচেয়ে ভাগ্যবান হিসাবে চিহ্নিত হয়েছেন রঘু। সম্ভবত এই কারণেই কালিদাস এই মহাকাব্যের নামকরণ করেছেন 'রঘুবংশ'। কাব্যিক এই গুণাবলী ছাড়াও ঐতিহাসিক দিক থেকে এই মহাকাব্যটি গুরুত্বপূর্ণ। এতে গুপ্ত শাসকগণ যথা— সমুদ্রগুপ্ত ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের কথা বর্ণিত হয়েছে।

রঘুবংশের ন্যায় কুমারসম্ভব মহাকাব্যটিও কালিদাস শেষ করে যেতে পারেননি। এটি সতেরোটি সর্গে বিভক্ত। এরকম বলা হয়ে থাকে এক থেকে আটটি সর্গ কালিদাস রচনা করেছিলেন—বাকিগুলি অসমাপ্ত থেকে যায়। বাকি নয়টি সর্গ তাঁর উত্তরসূরি কোনো কবি পরবর্তীকালে সংযোজন করেছিলেন। কুমারসম্ভব রচনার ক্ষেত্রে রামায়ণের কিছু অংশের প্রভাব রয়েছে বলে সাধারণভাবে মনে করা হয়। যাইহোক না কেন, এই কাব্যটিতে শিব ও পার্বতীর বিবাহ, তাঁদের পুত্র কুমার কার্তিকের জন্ম এবং তারকাসুরের ধ্বংসসাধনের কথা বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া এই কাব্যটির সূচনা ঘটেছে হিমালয় পর্বতের

Scanned with CamScanner

গুপ্তযুগের সংস্কৃত সাহিত্যে অন্যান্য প্রতিভা

গুপ্তযুগের শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার হিসাবে কালিদাসের নাম অবিসংবাদিত হলেও তাঁর সমকালীন যুগে ও কিছুটা পরবর্তীকালে কয়েকজন কবি ও নাট্যকারের আবির্ভাব ঘটেছিল যাঁরা সংস্কৃত ভাষায় কাব্য ও নাটক লিখেছিলেন। এই পর্বে অন্য কবিদের মধ্যে অন্যতম হলেন ভারবি। লেখক হিসাবে কালিদাসের সঙ্গে ভারবির নামোল্লেখ আছে ৬৩৪ খ্রি-এর আইহোল প্রশস্তিতে। ভারবিকে সাধারণ খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের লেখক হিসাবে ধরা হয়ে থাকে। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ হল কিরাতার্জুনীয়। আঠারোটি সর্গে বিভক্ত কিরাতার্জুনীয় কাব্যটি মহাকাব্য হিসাবেও গণ্য করা হয়ে থাকে। এর প্রধান ভিত্তি মহাভারত। এই কাব্যটির মূল বিষয়বস্তু হল অর্জুনের সঙ্গে কিরাতের ছদ্মবেশে শিবের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে অর্জুনের বীরত্ব দেখে শিব অভিভূত ও সন্তুষ্ট হন এবং অর্জুনকে

তাকে শাস্ত্রগত অনুসরণ করেন। এছাড়া খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের কবি ভট্টি রচনা করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত কাব্যিক গ্রন্থটি, যা রাবণবধ নামেও পরিচিত। বলভীরাজ শ্রীধর সেনের পৃষ্ঠপোষকতায় এই কাব্যটি রচিত হয়েছিল।

কালিদাসের সমসাময়িক যুগে দুজনের নাম পরিচিত। একজন হলেন শূদ্রক এবং অপর জন বিশাখদত্ত। কালিদাসের মতো খ্যাতিমান না হলেও শূদ্রকের লেখা মৃচ্ছকটিকম্ নাটকটি উল্লেখের দাবি রাখে। শূদ্রক খুব সম্ভবত খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বিশাখদত্তের সময়কাল যথেষ্ট বিতর্কিত হলেও তাঁর রচিত নাটকগুলি উল্লেখযোগ্য। দুটি বিখ্যাত নাটক তিনি রচনা করেছিলেন, সেগুলি ইতিহাস রচনার কাজেও লাগে। এগুলি হল যথাক্রমে মুদ্রারাক্ষস ও দেবী-চন্দ্রগুপ্তম। প্রথমটির কাহিনী অত্যন্ত জটিলভাবে বিন্যস্ত। এতে চাণক্যের সাহায্যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কিভাবে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন তার বর্ণনা আছে। দ্বিতীয়টিতে গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল ও তাঁর বড় ভাই (?) রামগুপ্তের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য ছাড়াও গুপ্তযুগে বেশ কিছু দার্শনিক সাহিত্য রচিত হয়েছিল। বস্তুত দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে বহু মৌলিক তত্ত্ব সৃষ্টি হয়েছিল এযুগে। সাংখ্য দর্শনের ওপর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা গ্রন্থে। ঈশ্বরকৃষ্ণ খুব সম্ভবত খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগের আগে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই সাংখ্যকারিকা গ্রন্থটি পরবর্তীকালে অনুবাদও হয়েছিল। পতঞ্জলির যোগসূত্র বা যোগ দর্শনের ওপর ব্যাখ্যা করেছিলেন ব্যাস, যাঁকে ব্যাসের পূর্ববর্তী বলে মনে করা হয়। এই হিসাবে ব্যাসকে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ বা সপ্তম শতকের মানুষ বলে মনে করা যেতে পারে। পক্ষিল স্বামীন বাৎস্যায়ন ন্যায়সূত্রের প্রথম ব্যাখ্যা রচনা করেছিলেন। সাধারণভাবে তাঁকে খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের মধ্যভাগের মানুষ বলে মনে করা হয়। দিঙ্নাগ আবির্ভূত হয়েছিলেন খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের শেষদিকে। বৌদ্ধ দর্শনের ওপর তাঁর ব্যাখ্যা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। দিঙ্নাগের বিখ্যাত গ্রন্থ হল প্রমাণ সমুচ্চয়। মৈত্রেয়নাথ আনুমানিক ২৭০–৩৫০ খ্রি-এর মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং বসবাস করতেন অযোধ্যায়। আদর্শবাদী চিন্তাধারার ওপর তিনি বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এগুলি হল যথাক্রমে অভিসময়ালঙ্কার-কারিকা, মধ্যান্তবিভাগ ও বোধিসত্ত্বভূমি। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে মৈত্রেয়নাথের দ্বারা প্রবর্তিত যোগাচার দর্শনের প্রসার ঘটিয়েছিলেন অসঙ্গ। মৈত্রেয়নাথের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি মহাযানসংগ্রহ, অভিধর্মসমুচ্চয়, সপ্তদশ ভূমিশাস্ত্র প্রভৃতি রচনা করেছিলেন।

খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে আবির্ভূত হয়েছিলেন গান্ধারবাসী বসুবন্ধু। বৌদ্ধধর্মের ওপর তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। বিভাষাসূত্রগুলিকে সুসংহত করে তিনি রচনা করেছিলেন অভিধর্মকোষ। এছাড়া পরমার্থ সপ্ততি নামে তিনি একটি গ্রন্থ রচনা করেন ও এতে

Scanned with CamScanner

সাংখ্যদর্শনের সমালোচনা করেন। বেদান্ত দর্শনের ওপর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন গৌড়পাদ। তিনি ছিলেন বিখ্যাত শঙ্করের গুরু। খুব সম্ভবত খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি অদ্বৈতবাদ তত্ত্ব প্রচার করেন।

Scanned with CamScanner